5

উন্নয়নের কৌশল
(Strategy of Development)

5.1. ভূমিকা
(Introduction) :

একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য দুটি বিকল্প উন্নয়ন কৌশল আছে। একটিকে বলা হয় **সুষম উন্নয়ন কৌশল** (Balanced growth strategy) এবং অপরটিকে বলা হয় **অসম উন্নয়ন কৌশল** (Unbalanced growth strategy)। সুষম উন্নয়ন কৌশলের মূল বক্তব্য হল যে, একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য ঐ দেশের সমস্ত প্রধান ক্ষেত্রের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রেখে প্রসার ঘটাতে হবে। অপরদিকে, অসম উন্নয়ন কৌশলের মতে, কোন দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ শিল্পকে নির্বাচন করতে হবে এবং বিনিয়োগযোগ্য সম্পদের প্রায় সবটাই এই নির্বাচিত শিল্পগুলোতে বিনিয়োগ করতে হবে। স্বল্পোন্নত দেশে অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য কোন্ ধরনের উন্নয়ন কৌশল ব্যবহার করা উচিত, সে সম্পর্কে অর্থনীতিবিদদের মধ্যে তীব্র বিতর্ক ও মতভেদ আছে। একদিকে আছেন অর্থনীতিবিদ Nurkse, Lewis, Scitovsky, Rodan প্রমুখ যাঁরা সুষম উন্নয়ন কৌশলকে সমর্থন করেছেন। অন্যদিকে আছেন অর্থনীতিবিদ Hirschman এবং Singer যাঁরা অসম উন্নয়ন কৌশলের সমর্থক।

আমরা এই দুই ধরনের উন্নয়ন কৌশল নিয়ে একে একে আলোচনা করবো এবং তারপর তাদের মধ্যে পারস্পরিক তুলনা করারও চেষ্টা করবো। এছাড়া অনুন্নত দেশে আরও কয়েকটি নির্বাচনের সমস্যা আছে, যেমন, উপযুক্ত কলাকৌশল নির্বাচনের সমস্যা, কৃষি ও শিল্পের মধ্যে নির্বাচনের সমস্যা প্রভৃতি। সেই বিষয়গুলো নিয়েও এই অধ্যায়ে আলোচনা করা হবে।

5.2. সুষম উন্নয়ন কৌশল
(Balanced Growth Strategy) :

সুষম উন্নয়ন কথাটি দুটি অর্থে ব্যবহার করা যেতে পারে। **প্রথমত,** সুষম উন্নয়ন বলতে আমরা পরস্পর নির্ভরশীল বিভিন্ন শিল্পে একটি বড় ধরনের বিনিয়োগের কথা বোঝাতে পারি। **দ্বিতীয়ত,** সুষম উন্নয়ন বলতে দেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রের মধ্যে মোট বিনিয়োগকে এমনভাবে ভাগ করে দেওয়া বোঝাতে পারি যার ফলে দেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রের মধ্যে একটি ভারসাম্য বজায় থাকে। প্রথম অর্থে সুষম উন্নয়ন বলতে মোট বিনিয়োগের মাত্রা (Scale of investment)-কে বোঝানো হয়ে থাকে। সেক্ষেত্রে, বৃহৎ মাত্রায় উৎপাদন করলে তাকে সুষম উন্নয়ন বলা হচ্ছে। দ্বিতীয় অর্থে সুষম উন্নয়ন বলতে বিনিয়োগের মাত্রাকে না বুঝিয়ে বিনিয়োগের ধরনকে বোঝানো হয়ে থাকে। কীভাবে বিভিন্ন ক্ষেত্রের মধ্যে বিনিয়োগকে ভাগ করে দিলে বিভিন্ন ক্ষেত্রের মধ্যে ভারসাম্য বজায় থাকবে সেটিই হলো দ্বিতীয় অর্থে সুষম উন্নয়ন।

অধ্যাপক নার্কস্ এবং অধ্যাপক রোজেনস্টাইন রোডান প্রথম অর্থে সুষম উন্নয়ন কথাটি ব্যবহার করেছেন। এঁদের মতে অনুন্নত দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য একটি বড় ধরনের বিনিয়োগ প্রয়োজন। অধ্যাপক রোজেনস্টাইন রোডান তাঁর জোর ধাক্কা তত্ত্বে এই ধরনের বিনিয়োগের কথা বলেছেন। আবার অধ্যাপক নার্কস্ও দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র কীভাবে ভাঙা যায় সে সম্পর্কিত আলোচনায় এই ধরনের সুষম উন্নয়নের কথা বলেছেন। দ্বিতীয় অর্থে সুষম উন্নয়ন তত্ত্বটির প্রবক্তা অধ্যাপক লুইস। এই অর্থে দেশের কৃষি, শিল্প, ভোগ্য দ্রব্য, মূলধনী দ্রব্য, পরিবহন, যোগাযোগ প্রভৃতি বিভিন্ন ক্ষেত্রের মধ্যে মোট বিনিয়োগকে এরূপভাবে ভাগ করে দেওয়া উচিত যেন সব ক্ষেত্রই সুষ্ঠুভাবে বিকাশলাভ করতে পারে। কোন ক্ষেত্রেই যেন কোন দুষ্প্রাপ্যতা বা প্রাচুর্য দেখা না দেয়। সকল ক্ষেত্রেই যেন চাহিদা এবং যোগানের মধ্যে একটি ভারসাম্য বজায় থাকে।

প্রথম অর্থে সুষম উন্নয়ন কেন দরকার সে সম্পর্কিত আলোচনা আমরা এখন শুরু করতে পারি। অধ্যাপক রোডানের মতে, অনুন্নত দেশে যে বিভিন্ন ধরনের অবিভাজ্যতা দেখা দেয় সেগুলিকে দূর করার জন্য প্রথম অর্থে সুষম উন্নয়ন দরকার। এইসব অবিভাজ্যতাকে আমরা দুটি ভাগে ভাগ করতে পারি। একটি হলো **যোগানোর দিকে অবিভাজ্যতা** এবং অপরটি হলো **চাহিদার দিকে অবিভাজ্যতা**। যোগানের দিকে অবিভাজ্যতা হল সামাজিক স্থায়ী মূলধনের অবিভাজ্যতা এবং সঞ্চয় ও বিনিয়োগের অবিভাজ্যতা। অন্যদিকে চাহিদার দিকে অবিভাজ্যতা হল বাজারের সীমিত আয়তনের জন্য অনুন্নত দেশ যে বাধার সম্মুখীন হয় সেটি। এইসব অবিভাজ্যতা দূর করার জন্য একটি বড় ধরনের বিনিয়োগ করা দরকার। এই বড় ধরনের বিনিয়োগকেই সুষম উন্নয়ন বলা হয়ে থাকে।

অধ্যাপক নার্কসের মতে, অনুন্নত দেশে দারিদ্র্যের দুষ্টচক্রের পিছনে একটি বড় কারণ হ'ল উদ্যোক্তাদের বিনিয়োগ প্রবণতা কম। এর পিছনে আবার কারণ হল সংকীর্ণ বাজার। বাজারের সীমিত আয়তনের জন্য অনুন্নত দেশে যদি শুধু একটি মাত্র শিল্প স্থাপিত হয় তাহলে সেই শিল্প কখনই লাভজনক হয়ে উঠতে পারে না। ধরা যাক একটি অনুন্নত দেশে একটি জুতো তৈরির কারখানা স্থাপন করা হ'ল। এই কারখানায় যে শ্রমিকরা কাজ করবে তাদের আয় বৃদ্ধি পাবে। কিন্তু অর্থনীতির অন্যান্য ক্ষেত্রের জনসাধারণের আয় বৃদ্ধি না পেলে উৎপন্ন জুতোর চাহিদা সৃষ্টি হবে না। জুতো তৈরির কারখানাতে যারা নিযুক্ত হবে তারা সমস্ত জুতো কিনতে পারবে না। ফলে বাজারের অভাবে বা চাহিদার অভাবে জুতো তৈরির কারখানাটি লাভজনক হয়ে উঠবে না। অনুরূপভাবে, জুতো তৈরির কারখানার পরিবর্তে অন্য কোন ভোগ্য দ্রব্যের কারখানাও যদি অনুন্নত দেশে স্থাপন করা হয় তাহলে সেটিও বাজারের অভাবে সফল হয়ে উঠতে পারবে না। এইভাবে দেখা যায় যে অনুন্নত দেশে বাজারের আয়তন কম থাকার জন্য যদি একটিমাত্র কারখানা স্থাপন করা যায় সেই কারখানটি কখনই লাভজনক হয়ে উঠতে পারে না। এই বাধা দূর করার একমাত্র উপায় হল অনুন্নত দেশে শুধু একটিমাত্র কারখানা স্থাপন না করে একসঙ্গে অনেকগুলি কারখানা স্থাপন করা। যদি একসঙ্গে অনেকগুলি কারখানা স্থাপন করা যায় তাহলে একসঙ্গে অনেক লোকের আয় বৃদ্ধি পাবে। একটি কারখানায় নিযুক্ত শ্রমিকরা অন্য কারখানায় উৎপন্ন দ্রব্যের চাহিদা সৃষ্টি করবে। এইভাবেই সমস্ত কারখানায় উৎপন্ন দ্রব্যাদির বাজার সৃষ্টি হবে। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, চাহিদার অবিভাজ্যতার জন্য একটি কারখানা যেখানে সফল হতে পারবে না সেখানে একযোগে অনেকগুলি কারখানা স্থাপন করলে সেটি সফল হতে পারবে।

যোগানের দিকে অবিভাজ্যতা বলতে সামাজিক স্থায়ী মূলধনের অবিভাজ্যতাকেই বোঝানো হয়। অধ্যাপক রোডানের মতে সামাজিক স্থায়ী মূলধন, যথা, পরিবহন, বিদ্যুৎ সরবরাহ, সেচ প্রকল্প ইত্যাদি অল্প পরিমাণে গড়ে তুললে তাতে কোন সুফল পাওয়া যায় না। উদাহরণস্বরূপ, যদি কোথাও রাস্তা নির্মাণ করতে হয় তাহলে গোটা রাস্তাটি নির্মাণ করলে তবেই তার সুফল পাওয়া যায়। আবার কোথাও সেচের খাল করতে হলে, সমগ্র খালটি শেষ করলে তবেই তার সুফল পাওয়া যায়। এইজন্য এই ধরনের মূলধনকে অবিভাজ্য বলা হয়। এছাড়া সামাজিক স্থায়ী মূলধন গঠন করতে বহু অর্থ ব্যয় করতে হয়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে এই ধরনের স্থায়ী মূলধন গঠন করলে এদের থেকে উপকার পাওয়া যায় না। সামাজিক স্থায়ী মূলধন গঠন করার জন্য বেশ বড় ধরনের অর্থ বিনিয়োগ করতে হয়। সেজন্য এই ধরনের বিনিয়োগকে অবিভাজ্য বিনিয়োগ বলা হয়ে থাকে।

অধ্যাপক রোডানের মতে অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রের মধ্যে পরিপূরক সম্পর্ক থাকার জন্য এক ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করলে অন্য ক্ষেত্রেও তার প্রভাব পড়ে থাকে। এই ধরনের প্রভাবকে বাহ্যিক ব্যয় সংকোচের মাধ্যমে প্রকাশ করা যেতে পারে। বাহ্যিক ব্যয় সংকোচ কথাটি এখানে প্রচলিত অর্থে ব্যবহার করা হচ্ছে না। প্রচলিত অর্থে একটি ফার্মের বিস্তারের ফলে যদি অন্য ফার্মের ব্যয় কমে তাহলে যে ফার্মের ব্যয় কমছে সেই ফার্ম বাহ্যিক ব্যয় সংকোচ ভোগ করছে বলা হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে বাহ্যিক ব্যয় সংকোচ কথাটি একটু ভিন্ন অর্থে ব্যবহার করা হচ্ছে। যদি কোন একটি প্রকল্প এককভাবে গ্রহণ করা হয়, তাহলে এই প্রকল্পের ব্যয় যা হয় সেই ব্যয়কে ধরা যাক, আমরা ব্যক্তিগত ব্যয় (Private cost) বলে ধরছি। অন্যদিকে এই প্রকল্পটিকে এককভাবে গ্রহণ না করে যদি এই প্রকল্পটিকে একটি বৃহৎ প্যাকেজের অংশ হিসাবে ধরা হয় তাহলে এই

প্রকল্পের যা ব্যয় হয় সেটিকে এই প্রকল্পের সামাজিক ব্যয় (Social cost) হিসাবে ধরা হচ্ছে। যখন বাহ্যিক ব্যয় সংকোচ থাকে তখন কোন প্রকল্পের ব্যক্তিগত ব্যয়, সামাজিক ব্যয় অপেক্ষা বেশি হয়। অর্থাৎ কোন প্রকল্পকে এককভাবে গ্রহণ না করে যদি একটি প্যাকেজের অন্তর্ভুক্ত প্রকল্প হিসাবে গ্রহণ করা হয়, তাহলে ঐ প্রকল্পটি অনেক কম খরচে রূপায়ণ করা সম্ভব। প্যাকেজের মধ্যে অন্যান্য প্রকল্পও অন্তর্ভুক্ত থাকে। সব প্রকল্পকে এক সঙ্গে রূপায়িত করলে তাদের মোট ব্যয় যা হবে প্রতিটি প্রকল্পকে পৃথক পৃথকভাবে রূপায়িত করলে তাদের মোট ব্যয় অনেক বেশি হবে। সব প্রকল্পকে একসঙ্গে একটি প্যাকেজ হিসাবে গ্রহণ করে রূপায়িত করতে হলে বড় ধরনের বিনিয়োগ করা দরকার। এটিকেই সুষম উন্নয়ন কৌশল বলা হয়ে থাকে। এরূপ বড় ধরনের বিনিয়োগ করলে তবেই বাহ্যিক ব্যয় সংকোচের সুবিধা সমস্ত প্রকল্পই পেতে পারে। তার ফলে প্রকল্পগুলি রূপায়ণের মোট ব্যয় অপেক্ষাকৃত কম হয়। রোডানের মতে এই বাহ্যিক ব্যয় সংকোচের সুবিধা ভোগ করতে হলে সুষম উন্নয়ন কৌশল গ্রহণ করতে হবে এবং একসঙ্গে বড় ধরনের বিনিয়োগ করতে হবে।

অধ্যাপক রোডান তাঁর যুক্তিকে পরিস্ফুট করার জন্য একটি চমৎকার উদাহরণ দিয়েছেন। ধরা যাক, একটি ভূগর্ভস্থ রেলপথ তৈরির কথা ভাবা হচ্ছে। ঐ প্রকল্পের ব্যয় ও সুবিধা বিশ্লেষণ (cost-benefit analysis) করা হল। দেখা গেল, ব্যয় সুবিধা অপেক্ষা বেশি অর্থাৎ প্রকল্পটি লাভজনক নয়। তখন, ভূগর্ভস্থ রেল প্রকল্পের সাথে সাথে ঐ রেলপথের উপরে স্টেশনগুলোতে বাজার তৈরির প্রকল্পও গ্রহণ করা হল। তখন দেখা গেল যে, দু'টি প্রকল্প একযোগে গ্রহণ করলে তা লাভজনক হচ্ছে। আসলে রেলপথ প্রবর্তিত হলে ঐ রেলপথের উপর স্টেশনগুলোতে বাজার সৃষ্টি হবে। ঐ বাজারের সুবিধাটাও গ্রহণ করতে হবে। তবেই সমগ্র প্রকল্পটি একযোগে লাভজনক হবে। লক্ষণীয় যে, শুধু রেলপথটি বা শুধু বাজার তৈরির প্রকল্প লাভজনক হবে না। দুটি প্রকল্পকে একযোগে একটি প্যাকেজ হিসাবে গ্রহণ করে বড় ধরনের বিনিয়োগ করতে হবে। তবেই সেই বিনিয়োগ লাভজনক হবে। এই ধরনের বড় বিনিয়োগকেই প্রথম অর্থে সুষম উন্নয়ন বলা হচ্ছে।

এবার দ্বিতীয় অর্থে সুষম উন্নয়ন কেন প্রয়োজন সেটি আলোচনা করা যাক। অধ্যাপক লুইসের মতে সুষম উন্নয়ন বলতে দেশের মোট বিনিয়োগকে বিভিন্ন ক্ষেত্রের মধ্যে এরূপভাবে ভাগ করে দেওয়াকে বোঝায় যাতে বিভিন্ন ক্ষেত্রের মধ্যে একটি ভারসাম্য বজায় থাকে। সমস্ত ক্ষেত্রেই যে সম পরিমাণ বিনিয়োগ করতে হবে তার কোন মানে নেই। বিভিন্ন ক্ষেত্রের মধ্যে বিনিয়োগ এমনভাবে ভাগ করে দিতে হবে যেন বিভিন্ন ক্ষেত্রের উৎপন্ন দ্রব্যের চাহিদা এবং যোগান পরস্পর সমান হয়। অর্থাৎ বিভিন্ন ক্ষেত্রের মধ্যে যেন ভারসাম্য বজায় থাকে। একটি ক্ষেত্রের বিকাশ যেন অন্য ক্ষেত্রের বিকাশ না হওয়ার জন্য ব্যাহত না হয়। যদি একটি ক্ষেত্রের বিকাশ অন্য ক্ষেত্রের বিকাশের অভাবে ব্যাহত হয় তাহলে বিভিন্ন ক্ষেত্রের মধ্যে ভারসাম্য বজায় থাকবে না। ভারসাম্য বজায় থাকলে কোন ক্ষেত্রের উৎপন্ন দ্রব্যের অভাব বা কোন ক্ষেত্রের উৎপন্ন দ্রব্যের অপচয় দেখা যাবে না।

অধ্যাপক লুইস কৃষি এবং শিল্প এই দুটি ক্ষেত্রের ভারসাম্য বজায় রাখার পক্ষে গুরুত্ব আরোপ করেছেন। লুইসের মতে কৃষি এবং শিল্পের মধ্যে একটি পরিপূরক সম্পর্ক আছে। কৃষির উন্নয়ন শিল্পের উন্নয়নের উপর নির্ভর করে। আবার শিল্পের উন্নয়নও কৃষির উন্নয়নের উপর নির্ভর করে। শিল্পের উন্নয়ন ঘটলে কৃষিতে উৎপন্ন কাঁচামালের চাহিদা বৃদ্ধি পায়। কৃষিতে উৎপন্ন খাদ্যশস্যের চাহিদা বৃদ্ধি পায়। এছাড়া সার, কীটনাশক প্রভৃতি উৎপাদনের উপাদান কৃষিক্ষেত্রে যোগান দেওয়া সম্ভব হয়। কৃষিক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির যোগানও বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়। এইভাবে শিল্পের উন্নয়ন হলে সেটি কৃষির উন্নয়নকে সাহায্য করে। আবার কৃষির উন্নয়ন ঘটলে কৃষিক্ষেত্র শিল্পক্ষেত্রকে কাঁচামালের যোগান দিতে পারে ; শিল্পক্ষেত্রকে খাদ্যের যোগান দিতে পারে। কৃষিক্ষেত্রের লোকেদের আয় বৃদ্ধি পেলে শিল্পজাত দ্রব্যের চাহিদাও বৃদ্ধি পায়। কৃষি এবং শিল্পের মধ্যে এরূপ পরিপূরক সম্পর্ক থাকার জন্য উভয় ক্ষেত্রকে একযোগে বিকশিত করতে হবে। যদি শিল্পের উপর বেশি জোর দেওয়া হয় এবং শিল্পক্ষেত্রেই অধিক বিনিয়োগ করা হয়, কিন্তু কৃষিক্ষেত্রটি যদি অবহেলিত থাকে, তাহলে

শিল্পের বিকাশ বাধাপ্রাপ্ত হবে। অবার যদি কৃষিক্ষেত্রেই অতিরিক্ত বিনিয়োগ করা হয় এবং যদি শিল্পক্ষেত্রটি অবহেলিত থাকে তাহলেও একটি স্তরের পর কৃষির বিকাশও ব্যাহত হবে। সেজন্য সুষম বিকাশ ঘটানোর জন্য কৃষি এবং শিল্পের উপর সমান গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন। কৃষিজাত দ্রব্যের চাহিদা এবং যোগান যাতে সমান হয় এবং শিল্পজাত দ্রব্যেরও চাহিদা এবং যোগান যাতে সমান হয় এইভাবে মোট বিনিয়োগকে কৃষি এবং শিল্পের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া উচিত।

অনুরূপভাবে, শিল্পক্ষেত্রের মধ্যেও ভোগ্য দ্রব্য এবং মূলধনী দ্রব্যের সুষম বিকাশ ঘটা দরকার। তার কারণ ভোগ্য দ্রব্য উৎপাদন করতে হলে মূলধনী দ্রব্য প্রয়োজন। আবার মূলধনী দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদন করলেও সেই মূলধনী দ্রব্যসামগ্রীগুলি বিক্রি করার জন্য ভোগ্য দ্রব্যের বিকাশ ঘটা প্রয়োজন। আবার মূলধনী দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদনের কাজে যেসব শ্রমিক নিযুক্ত থাকবে তাদের ভোগের জন্যও ভোগ্য দ্রব্য প্রয়োজন। সুতরাং ভোগ্য দ্রব্য এবং মূলধনী দ্রব্যের মধ্যেও একটি সুষম উন্নয়ন ঘটা প্রয়োজন। আবার কৃষি এবং শিল্পের সঙ্গে সেবাক্ষেত্রেরও একটি যোগসূত্র আছে। কৃষি এবং শিল্পের উন্নয়ন যেমন সেবাক্ষেত্রের উন্নয়নের উপর নির্ভরশীল, অনুরূপভাবে সেবাক্ষেত্রের উন্নয়নও কৃষি এবং শিল্পের উন্নয়নের উপর নির্ভর করে। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটাতে হলে কৃষি, শিল্প, পরিবহন, সেবাক্ষেত্র ইত্যাদি সমস্ত ক্ষেত্রেরই সুষম বিকাশ ঘটানো দরকার। খণ্ড খণ্ড বা বিচ্ছিন্নভাবে অর্থনৈতিক উন্নয়ন না ঘটিয়ে এইভাবে একটি অবিচ্ছিন্ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অর্থনীতির সমস্ত ক্ষেত্রের সুষম উন্নয়ন ঘটানো যেতে পারে। এটাই হল দ্বিতীয় অর্থে সুষম উন্নয়ন কৌশলের প্রধান বক্তব্য।

5.3. সুষম উন্নয়ন তত্ত্বের মূল্যায়ন (An Evaluation of the Balanced Growth Theory) ঃ

সুষম উন্নয়ন কৌশলের কয়েকটি সুবিধা আছে। সুষম উন্নয়ন তত্ত্বের প্রবক্তারা এই কৌশলের নিম্নলিখিত সুবিধা দাবি করেছেন ঃ

প্রথমত, এই কৌশলে অর্থনীতির প্রতিটি প্রধান ক্ষেত্রের একযোগে উন্নয়নের কথা বলা হচ্ছে। সুতরাং এতে অর্থনীতিতে কোনো ভারসাম্যহীনতা ঘটবে না। **দ্বিতীয়ত,** সুষম উন্নয়ন কৌশল বাজার প্রসারিত করে। আর বাজার প্রসারিত হলে শ্রম বিভাজন ও বিশেষায়ণের সুযোগ পাওয়া যায়। ফলে শ্রমিকের উৎপাদনশীলতা ও উৎপন্ন দ্রব্যের মান উভয়ই বৃদ্ধি পায়। **তৃতীয়ত,** সুষম উন্নয়ন কৌশল গ্রহণ করলে বাহ্যিক ব্যয়সংকোচের সুযোগ সর্বাধিক ভোগ করা যায়। Scitovsky এই যুক্তিতেই সুষম উন্নয়ন কৌশল সমর্থন করেছেন। তিনি যুক্তি দেখিয়েছেন যে, x শিল্প প্রসারিত হলে 4 ধরনের বাহ্যিক ব্যয়সংকোচ ভোগ করা যায়।

(a) যে শিল্প x দ্রব্যকে উপাদান হিসাবে ব্যবহার করে, সেই শিল্প সুবিধা পাবে।

(b) x-এর সঙ্গে পরিপূরক উপাদান হিসাবে যেগুলো ব্যবহৃত হয়, সেই শিল্পগুলো সুবিধা পাবে।

(c) x তৈরিতে নিযুক্ত উপাদানগুলোর শিল্পগুলো সুবিধা পায়।

(d) x তৈরির জন্য যেসকল উপকরণ লাগে, তাদের বিকল্প বা পরিবর্ত দ্রব্য উৎপাদনকারী শিল্পগুলোও লাভবান হয়।

যদি সুষম উন্নয়ন কৌশল অনুযায়ী সব শিল্পে একসঙ্গে বিনিয়োগ করা হয়, তাহলে এই বাহ্যিক ব্যয়সংকোচ (External economies) সর্বাধিক হবে।

চতুর্থত, সুষম উন্নয়ন কৌশলে সমস্ত শিল্পে একসঙ্গে বিনিয়োগ করা হয়। ফলে কোনো ক্ষেত্রে দুষ্প্রাপ্যতা দেখা দেয় না। এর ফলে দামস্তরের স্থায়িত্ব (Stability) থাকে।

পঞ্চমত, সুষম উন্নয়ন কৌশল গ্রহণ করলে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে উন্নয়নের মধ্যে সমতা থাকে, শিল্পায়নে আঞ্চলিক বৈষম্য দেখা দেয় না।

কিন্তু অসম উন্নয়নের সমর্থকেরা, যেমন, Hirschman, Singer, Kurihara প্রভৃতি অর্থনীতিবিদগণ সুষম উন্নয়নের **বিরুদ্ধে কয়েকটি যুক্তি** দেখিয়েছেন।

প্রথমত, Hirschman এর মতে, অনুন্নত দেশের পক্ষে সুষম উন্নয়ন কৌশল গ্রহণ করা সম্ভব নয়। কারণ এর জন্য যে বিপুল পরিমাণ অর্থনৈতিক সম্পদ প্রয়োজন, অনুন্নত দেশের তা নেই। একসঙ্গে অনেক শিল্প স্থাপন করতে হলে প্রচুর মূলধন প্রয়োজন। কিন্তু অনুন্নত দেশের প্রধান সমস্যাই হলো মূলধনের স্বল্পতা। যদি সুষম উন্নয়ন কৌশল গ্রহণ করার মত প্রচুর মূলধন অনুন্নত দেশের থাকতো, তাহলে সেই দেশটি কেন অনুন্নত রয়ে যাবে তার কোন ব্যাখ্যা সুষম উন্নয়ন তত্ত্বে দেওয়া সম্ভব নয়।

দ্বিতীয়ত, নার্কস্ ধরে নিয়েছেন যে বিনিয়োগের প্রবণতা কম হওয়ার কারণ হল অভ্যন্তরীণ বাজারের সঙ্কীর্ণতা। নার্কস্ এক্ষেত্রে বৈদেশিক বাজারের ভূমিকাকে অবহেলা করেছেন। বৈদেশিক বাজার উদ্বৃত্ত উৎপাদন কিনতে পারে। তাছাড়া সুষম উন্নয়ন কৌশল আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের তুলনামূলক ব্যয় তত্ত্বের বিরোধী। এই তত্ত্বের বক্তব্য হ'ল, কোনো দেশের সেই দ্রব্য উৎপাদনে বিশেষায়ণ করা উচিত, যে দ্রব্য উৎপাদনে সেই দেশের আপেক্ষিক ব্যয় সুবিধা বর্তমান।

তৃতীয়ত, সুষম উন্নয়ন কৌশলের ভিত্তি হ'ল সে'-র নিয়ম (Say's Law) যার মূলকথা "Supply creates its own demand". কিন্তু কার্যকরী চাহিদার স্বল্পতার সমস্যাও অনুন্নত দেশে থাকতে পারে।

চতুর্থত, সুষম উন্নয়ন কৌশলের প্রবক্তারা ধরে নিয়েছেন যে অনুন্নত দেশে পর্যাপ্ত পরিমাণে সাংগঠনিক উদ্যোগ ও দক্ষতা (Entrepreneurial ability) আছে। কিন্তু অনুন্নত দেশের প্রধান অসুবিধা হল উদ্যোক্তার অভাব।

পঞ্চমত, সুষম উন্নয়ন কৌশলে ধরে নেওয়া হচ্ছে যে, দেশের প্রতিটি ক্ষেত্র, প্রতিটি অঞ্চল বা শিল্প একই উন্নতির বা অনুন্নতির স্তরে আছে। বাস্তব চিত্র কিন্তু অন্য। বাস্তবে কিছু শিল্প এগিয়ে থাকে, কিছু শিল্প পিছিয়ে থাকে। সুতরাং এই প্রাথমিক অসমতা দূর করার জন্যই পুনরায় অসম উন্নয়ন কৌশল প্রয়োজন।

ষষ্ঠত, হার্সম্যানের মতে সুষম উন্নয়ন কৌশল শুধুমাত্র যে অসম্ভব তাই নয়, এই কৌশল প্রয়োগ করারও কোন প্রয়োজন নেই। সুষম উন্নয়ন কৌশল প্রয়োগের পরিবর্তে যদি অসম উন্নয়ন কৌশল গ্রহণ করা যায় তাহলে আরও দ্রুত হারে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব। হার্সম্যানের বক্তব্য হ'ল এই যে, অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রের মধ্যে যদি একটি পরিপূরক সম্পর্ক থাকে তাহলে একটি ক্ষেত্রের বিকাশ ঘটালেই এটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে অন্য ক্ষেত্রটিকে বিকশিত হ'তে সাহায্য করবে। উদাহরণস্বরূপ, যদি কৃষি এবং শিল্পের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান থাকে তাহলে একই সঙ্গে কৃষি এবং শিল্পের উন্নতি না ঘটিয়ে শুধুমাত্র কৃষির বা শুধুমাত্র শিল্পের উন্নতি ঘটালেই চলবে। একটির উন্নতি ঘটালে অন্যটি আপনা-আপনি উন্নত হয়ে উঠবে। বিভিন্ন ক্ষেত্রের উন্নয়নের মধ্যে যদি ভারসাম্যহীনতা আনা যায় তাহলে বাজারি শক্তিগুলি সক্রিয় হয়ে উঠবে এবং ভারসাম্য অর্জন করতে সচেষ্ট হবে। এর ফলে একটি ক্ষেত্রের উন্নয়ন ঘটিয়েই অন্য ক্ষেত্রকে এগিয়ে আসতে সাহায্য করা হবে।

সপ্তমত, সুষম উন্নয়ন তত্ত্বে ধরে নেওয়া হয় যে অনুন্নত দেশে প্রচুর পরিমাণ মূলধন, প্রচুর পরিমাণ দক্ষ শ্রমিক প্রভৃতি রয়েছে। এগুলি না থাকলে একসঙ্গে বড় ধরনের বিনিয়োগ করা সম্ভব নয়। অনেকে মনে করেন, যে উন্নত অর্থনীতি বাণিজ্যচক্রের নিম্নগতির প্রকোপ থেকে ভুগছে, সেই অর্থনীতির ক্ষেত্রে সুষম উন্নয়ন তত্ত্বটি প্রযোজ্য হতে পারে ; কিন্তু অনুন্নত দেশের ক্ষেত্রে সুষম কৌশলটি প্রযোজ্য নয়।

অষ্টমত, সুষম উন্নয়ন কৌশল প্রয়োগ করতে হলে যখন বড় ধরনের বিনিয়োগ করা হয় তখন মূলধনী দ্রব্যসামগ্রীর চাহিদা দ্রুত হারে বাড়ে। অনুরূপভাবে দক্ষ শ্রমিকের চাহিদাও দ্রুত হারে বাড়ে। এর ফলে বিভিন্ন উৎপাদনের উপাদানের দাম বৃদ্ধি পায়। উৎপাদনের উপকরণের দাম বৃদ্ধি পেলে দেশে ব্যয়বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিতে পারে।

নবমত, অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রের সুষম উন্নয়ন ঘটাতে হলে বিভিন্ন ক্ষেত্রের উৎপন্ন দ্রব্যের চাহিদা কত হবে সেটি সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। সম্পূর্ণরূপে পরিকল্পিত অর্থনীতিতে একটি কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষ থাকে। এই কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষ অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রের চাহিদা পরিমাপ করতে পারে।

কিন্তু অপরিকল্পিত অর্থনীতিতে অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রের চাহিদা কত হবে সেটি সঠিকভাবে পরিমাপ করা যায় না। কাজেই পরিকল্পিত অর্থনীতিতেই শুধুমাত্র সুষম উন্নয়ন কৌশল গ্রহণ করা সম্ভব। মিশ্র অর্থনীতিতে বা অবাধ অর্থনীতিতে সুষম উন্নয়ন কৌশল গ্রহণ করা সম্ভব নয়।

বলা যেতে পারে যে তাত্ত্বিক দিক দিয়ে সুষম উন্নয়নের তত্ত্বটি গ্রহণযোগ হলেও বাস্তবে এই তত্ত্বটি প্রয়োগ করা সম্ভব নয়। মূলধন এবং উৎপাদনের অনান্য উপকরণের স্বল্পতার জন্য কোন একটি দেশের পক্ষে সুষম উন্নয়ন কৌশল গ্রহণ করা সম্ভব নয়। অসম উন্নয়ন কৌশলই এজন্য গ্রহণ করা উচিত। তবে মনে রাখতে হবে যে, অসম উন্নয়ন কৌশল ইচ্ছাকৃতভাবে ভারসাম্যহীনতা সৃষ্টি করে অর্থনৈতিক উন্নয়নের চেষ্টা করে। আর অধিকমাত্রায় ভারসাম্যহীনতা অর্থনীতিতে নানা বিশৃঙ্খলা ঘটাতে পারে। কাজেই অসম উন্নয়ন কৌশল গ্রহণ করা হলেও যে ক্ষেত্রগুলোকে উন্নয়নের জন্য প্রাথমিকভাবে নির্বাচন করা হচ্ছে, সেগুলোর মধ্যে যাতে একটা ভারসাম্য বজায় থাকে, সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। আরও একটি কথা বলা প্রয়োজন। অসম উন্নয়ন কৌশল একটি উপায় মাত্র। এর লক্ষ্য হল দীর্ঘকালে সুষম উন্নয়ন অর্জন করা। কাজেই সুষম উন্নয়ন হল শেষ লক্ষ্য (ends), আর অসম উন্নয়ন কৌশল হল সেই লক্ষ্যে পৌঁছানোর উপায় (means)। কাজেই উভয়ের মধ্যে মূলত কোন বিরোধ নেই। এ প্রসঙ্গে অর্থনীতিবিদ Singer-এর কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য : "The doctrine of balanced growth is premature rather than wrong in the sense that it is applicable to a subsequent stage of sustained growth rather than to the breaking of a deadlock". অর্থাৎ অনুন্নত দেশের যে প্রাথমিক অচল ও অনড় অবস্থা, তা দূর করতে সুষম উন্নয়ন কৌশল নয়, অসম উন্নয়ন কৌশলই গ্রহণ করা উচিত। উন্নয়নের পরবর্তী স্তরে যখন দেশটি স্বয়ংচালিত উন্নয়নের পথে অগ্রসর হয়, তখন অর্থনৈতিক উন্নয়নকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য সুষম উন্নয়ন কৌশল গ্রহণ করা যেতে পারে।

5.4. অসম উন্নয়ন কৌশল (Unbalanced Growth Strategy) ঃ

অর্থনীতিবিদ Hirschman এবং Singer সুষম উন্নয়নের বিকল্প পন্থা হিসাবে অসম উন্নয়ন কৌশল ধারণাটির অবতারণা করেন। তাঁদের মতে, স্বল্পোন্নত দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে প্রধান বাধা হল উৎপাদনশীল উপকরণের স্বল্পতা। উপকরণের স্বল্পতার জন্যই সুষম উন্নয়ন কৌশল গ্রহণ করা সম্ভব হয় না। অনুন্নত দেশের মূলধন কম থাকে। এছাড়া দক্ষ শ্রমিক, দক্ষ উদ্যোক্তাও কম থাকে। একসঙ্গে বড় ধরনের বিনিয়োগ করা সম্ভব হয় না। কাজেই স্বল্পোন্নত দেশের পক্ষে সব থেকে গ্রহণযোগ্য পদ্ধতি হল বিভিন্ন ক্ষেত্রের মধ্যে অসম উন্নয়ন।

হার্সম্যানের বক্তব্য হল এই যে, অনুন্নত দেশের উপকরণ স্বল্প। এই স্বল্প পরিমাণ উপকরণের বহু বিকল্প ব্যবহার হতে পারে। এখন প্রশ্ন হল ঃ সমস্ত বিকল্প ব্যবহারের স্বল্প সংখ্যক উপকরণকে নিয়োগ করা সম্ভব নয়। সুতরাং কোন্ কোন্ প্রকল্পকে গ্রহণ করলে সমাজের সুবিধা সর্বাধিক হবে ? অর্থাৎ কোন্ কোন্ প্রকল্পকে গ্রহণ করলে সেটি অর্থনৈতিক উন্নয়নকে সর্বাপেক্ষা বেশি সাহায্য করবে ?

হার্সম্যানের মতে, স্বল্পোন্নত দেশ বিনিয়োগ করার ব্যাপারে যখন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তখন দুই ধরনের বিনিয়োগের মধ্যে পার্থক্য করা যেতে পারে। একটি হলো পরিবর্ত নির্বাচন (Substitution choice) এবং অপরটি হলো স্থগিত রাখা নির্বাচন (Postponement choice)। প্রথম নির্বাচনটি হল এরূপ : ধরা যাক উৎপাদনের উপকরণগুলি A প্রকল্পে বিনিয়োগ করা যেতে পারে অথবা B প্রকল্পে বিনিয়োগ করা যেতে পারে। A এবং B এই দুটি পরস্পর বিচ্ছিন্ন প্রকল্প। এই দুটির যে কোন একটিকে গ্রহণ করা যেতে পারে। সমস্যা হল এই দুটির মধ্যে কোন্‌টিকে গ্রহণ করা হবে ? অর্থাৎ কোন্ প্রকল্পে বিনিয়োগ করা হবে? দ্বিতীয় নির্বাচন সমস্যাটি হলো ঃ A এবং B এই দুটি প্রকল্পতেই বিনিয়োগ করতে হবে। তবে প্রশ্ন হল ঃ কোন্‌টি অপেক্ষাকৃত বেশি গুরুত্বপূর্ণ ? কোন্‌টিকে আগে গ্রহণ করা হবে এবং কোন্‌টিকে পরে গ্রহণ করা হবে ? আমরা A প্রকল্পটি আগে গ্রহণ করব, না B প্রকল্পটি আগে গ্রহণ করব? হার্সম্যান মূলত এই দ্বিতীয় ধরনের

নির্বাচনের সমস্যা নিয়েই আলোচনা করেছেন। তাঁর মূল বক্তব্য হল এই যে, বিভিন্ন প্রকল্পের মধ্যে কোন্‌টিকে আগে গ্রহণ করা হবে সেটি স্থির করতে হবে কোন্ প্রকল্পটি গ্রহণ করলে সেটি অর্থনৈতিক উন্নয়নের পক্ষে সর্বাপেক্ষা অধিক অবদান সৃষ্টি করতে পারে তার উপর। অবদান বলতে এখানে অন্যান্য ক্ষেত্রের উপর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রভাবকে বোঝানো হচ্ছে। যে প্রকল্পে বিনিয়োগ করলে সমাজের অন্যান্য ক্ষেত্রের উপর প্রভাব সর্বাপেক্ষা বেশি হবে সেই প্রকল্পটিকেই আগে গ্রহণ করা উচিত—এটিই হার্সম্যানের বক্তব্য।

একটি উদাহরণের মাধ্যমে হার্সম্যান তাঁর বক্তব্যকে ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি কোন একটি দেশের বিনিয়োগকে দুটি ভাগে ভাগ করেছেন। একটিকে বলা হয় **সামাজিক স্থায়ী মূলধন** (Social Overhead Capital বা, সংক্ষেপে SOC) এবং অপরটি হলো **প্রত্যক্ষভাবে উৎপাদনশীল কাজকর্ম** (Directly Productive Activities বা, সংক্ষেপে DPA)। SOC বলতে বোঝায় রাস্তাঘাট নির্মাণ, সেচ, বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়ন, যোগাযোগ ও পরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়ন, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থা উন্নয়ন প্রভৃতি। এগুলিকে অর্থনৈতিক উন্নয়নের বহিরঙ্গ (Infrastructure)-ও বলা যেতে পারে। এই ধরনের সামাজিক স্থায়ী মূলধন গঠন করার জন্য বিনিয়োগ করা হলে প্রত্যক্ষভাবে ভোগ্য দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পায় না কিন্তু পরবর্তীকালে ভোগ্য দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য এগুলি পরোক্ষভাবে সাহায্য করে। অন্যদিকে, প্রত্যক্ষভাবে উৎপাদনশীল কাজকর্ম হল সেই ধরনের বিনিয়োগ যেখানে প্রত্যক্ষভাবে ভোগ্য দ্রব্যের উৎপাদন হয়ে থাকে। যদি স্বল্পোন্নত দেশের প্রচুর মূলধন থাকত তাহলে SOC এবং DPA এই দুটিকেই সমানভাবে গড়ে তোলা সম্ভব হত। কিন্তু অনুন্নত দেশে মূলধনের অভাব থাকার জন্য অনুন্নত দেশ একই সঙ্গে SOC এবং DPA গড়ে তুলতে পারে না। হার্সম্যানের মতে SOC এবং DPA কে একসঙ্গে গড়ে তোলারও প্রয়োজন নেই। এই দুটির মধ্যে যেকোনো একটি ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করলেই অপরটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে বৃদ্ধি পাবে।

সামাজিক স্থায়ী মূলধনে যদি বিনিয়োগ করা হয় তাহলে প্রত্যক্ষভাবে ভোগ্য দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পায় না, কিন্তু সামাজিক স্থায়ী মূলধনের সুবিধা ভোগ করার জন্য বেসরকারি বিনিয়োগকারীরা এগিয়ে আসে এবং প্রত্যক্ষভাবে ভোগ্য দ্রব্যের উৎপাদন শুরু করে। এইভাবে সামাজিক স্থায়ী মূলধনে বিনিয়োগ করা হলে সেটি প্রত্যক্ষভাবে উৎপাদনশীল কাজকর্মের ক্ষেত্রটিকে বিকাশলাভ করতে সাহায্য করে। এটি এক ধরনের অসম উন্নয়ন কৌশল। এই ধরনের অসম উন্নয়ন ঘটলে তাকে **উদ্বৃত্ত উৎপাদন ক্ষমতার মাধ্যমে উন্নয়ন** (Development via excess capacity) বলা হয়। যতদিন না পর্যন্ত প্রত্যক্ষভাবে উৎপাদনশীল কার্যকলাপ সৃষ্টি হচ্ছে ততদিন পর্যন্ত সামাজিক স্থায়ী মূলধনের সম্পূর্ণ ব্যবহার হবে না। সামাজিক স্থায়ী মূলধন উদ্বৃত্ত থাকবে। সেজন্য এই ধরনের উন্নয়নের পথকে উদ্বৃত্ত উৎপাদন ক্ষমতার মাধ্যমে উন্নয়ন বলা হয়।

অপর দিকে যদি প্রত্যক্ষভাবে উৎপাদনশীল কার্যকলাপের দিকে জোর দেওয়া হয় তাহলে উন্নয়নের প্রথমের দিকে সামাজিক স্থায়ী মূলধনের অভাব দেখা দেয়। তার ফলে অর্থনীতির ক্ষেত্রে নানারূপ চাপের সৃষ্টি হয়। এর ফলে ব্যক্তিগত উদ্যোক্তারা অথবা সরকার সামাজিক মূলধন যোগান দেওয়ার জন্য এগিয়ে আসে। এইভাবে যদি প্রাথমিক স্তরে DPA-র বিকাশ ঘটানো হয় তাহলে তা SOC কেও বিকশিত করতে সাহায্য করে। এই ধরনের উন্নয়নের পথকে **অপ্রাচুর্যতার মাধ্যমে উন্নয়ন** (Development via shortages) বলা হয়। হার্সম্যানের মতে এই উভয় পথেই কোন একটি অর্থনীতি বিকাশ লাভ করতে পারে। SOC কে জোর দিয়ে অথবা SOC কে অবহেলা করেও অর্থনীতির বিকাশ ঘটতে পারে। উভয় ক্ষেত্রেই একটিকে জোর দেওয়ার ফলে কিছু উৎসাহ বা চাপের সৃষ্টি হয় যার ফলে বিকাশ লাভ করে। এই দুটি বিকল্প অসম উন্নয়ন পথের মধ্যে কোন্‌টিকে কোন্ দেশ গ্রহণ করবে সেটি নির্ভর করছে কোন্‌টি গ্রহণ করলে অর্থনীতির উপর চাপ সব থেকে বেশি পড়বে বা, কোন্‌টি গ্রহণ করলে বেসরকারি বিনিয়োগকারীরা বেশি অনুপ্রাণিত হবে—বিনিয়োগ করার জন্য এগিয়ে আসবে তার উপর। একটি রেখাচিত্রের মাধ্যমে এই নির্বাচনের সমস্যাটি

ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। রেখাচিত্রে (চিত্র 5.1) আমরা অনুভূমিক অক্ষে SOC এবং উল্লম্ব অক্ষে DPA কে পরিমাপ করছি। এই চিত্রে q_0, q_1, q_2 প্রভৃতি হল সমোৎপাদন রেখা। বিভিন্ন পরিমাণ SOC এবং DPA দ্বারা সমান পরিমাণ মোট জাতীয় উৎপাদন পাওয়া গেলে সেই SOC এবং DPA-র সম্মিলনগুলি যোগ করে আমরা একটি সমোৎপাদন রেখা অঙ্কন করতে পারি। এরূপ পাঁচটি সমোৎপাদন রেখা রেখাচিত্রে আঁকা হয়েছে। এই রেখাগুলি নিম্নাভিমুখী এবং মূল বিন্দুর দিকে উত্তল হিসাবে ধরা হয়েছে। উপরের রেখাচিত্রে আমরা একটি 45° সরলরেখা অঙ্কন করেছি। এই রেখাটির বৈশিষ্ট্য হল এই যে, এই রেখার উপর SOC এবং DPA পরস্পর সমান। এই রেখাটির বরাবর অগ্রসর হলে SOC এবং DPA সমানভাবে গড়ে ওঠে। এই 45° রেখাটিকে সুষম উন্নয়নের পথ (Balanced growth path) বলা যেতে পারে। কিন্তু অনুন্নত দেশের পক্ষে এই সুষম উন্নয়ন পথ অনুসরণ করা সম্ভব হতে পারে না কারণ এই পথ ধরে চলার মত সম্পদ অনুন্নত দেশের থাকে না। যদি এই সুষম উন্নয়নের পথ ধরে অগ্রসর হওয়া না যায় তাহলে দুটি বিকল্প পথ ধরে অনুন্নত দেশ অগ্রসর হতে পারে। একটি হল a b c d.... পথ। এই পথটির বৈশিষ্ট্য হল যে এক্ষেত্রে প্রথমে SOC কে a থেকে b পরিমাণ বৃদ্ধি করা হল। SOC বৃদ্ধির ফলে DPA গড়ে ওঠে এবং অর্থনীতি তখন b থেকে c বিন্দুতে পৌঁছায়। পুনরায় SOC বৃদ্ধি করে c থেকে d বিন্দুতে যাওয়া হল। এই SOC বৃদ্ধি পুনরায় DPA কে বাড়িয়ে তোলে। ফলে অর্থনীতি d থেকে e বিন্দুতে গিয়ে পৌঁছায়। এইভাবে ক্রমাগত SOC বৃদ্ধির মাধ্যমে অসম উন্নয়ন ঘটতে পারে। এটি হল উদ্বৃত্ত ক্ষমতার মাধ্যমে উন্নয়নের (Development via excess capacity) দৃষ্টান্ত। অপর দিকে অর্থনীতিটি a থেকে b_1, c_1, d_1 এই পথেও অগ্রসর হতে পারে। এই পথটি হল অপ্রাচুর্যতার মাধ্যমে উন্নয়নের পথ (Development via shortages)। এক্ষেত্রে প্রথমে DPA বৃদ্ধি করা হলে অর্থনীতি c থেকে d_1 বিন্দুতে গিয়ে পৌঁছায়। তখন তার প্রভাবে পুনরায় SOC বৃদ্ধি পেয়ে অর্থনীতি d_1 থেকে e বিন্দুতে গিয়ে পৌঁছায়। এইভাবে DPA বৃদ্ধির মাধ্যমেও অসম উন্নয়ন ঘটতে পারে।

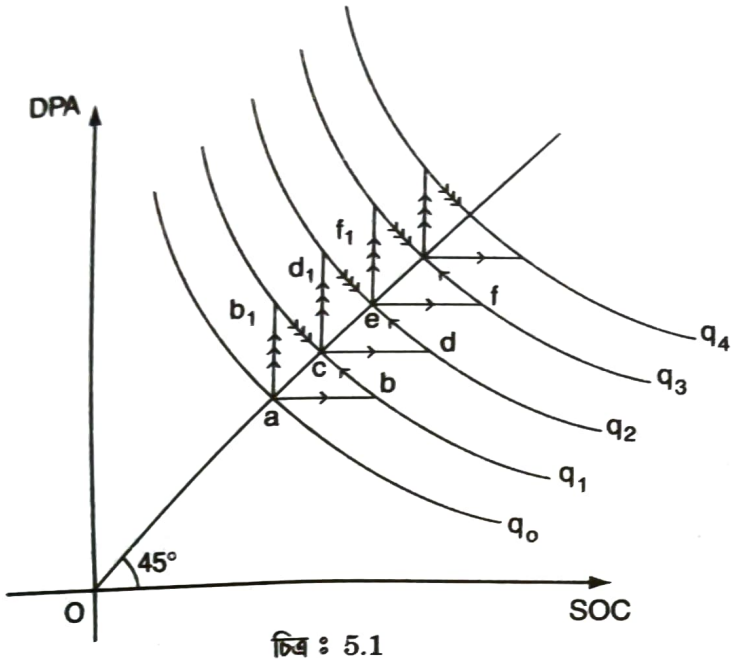

চিত্র ঃ 5.1

হার্সম্যানের মতে কোন একটি অনুন্নত দেশ SOC বৃদ্ধির মাধ্যমে উন্নয়ন ঘটাবে, না কি DPA বৃদ্ধির মাধ্যমে উন্নয়ন ঘটাবে সেটি নির্ভর করছে কোন্ পথটি গ্রহণ করলে সর্বাপেক্ষা বেশি প্ররোচনা বা উদ্দীপনা সৃষ্টি হয় তার উপর। এ সম্পর্কে পূর্ব নির্ধারিত সূত্র কিছু দেওয়া যায় না। তবে ঘাটতি বা অপ্রাচুর্যতার মাধ্যমে উন্নয়ন ঘটাতে চাইলে অর্থনীতিতে কিছু বিশৃঙ্খলা দেখা দিতে পারে। কিন্তু উদ্বৃত্ত ক্ষমতার মাধ্যমে উন্নয়ন ঘটালে সেই আশঙ্কা নেই।

প্রত্যক্ষভাবে উৎপাদনশীল বিভিন্ন কার্যকলাপের মধ্যে কোন্‌টিকে আগে গ্রহণ করা হবে এবং কোন্‌টিকে পরে গ্রহণ করা হবে সে সম্পর্কিত আলোচনায় হার্সম্যান বিভিন্ন ক্ষেত্রের সংযোগ প্রভাব (Linkage effect) এর কথা বলেছেন। হার্সম্যানের মতে কোন একটি ক্ষেত্রের বিকাশ ঘটলে দুই ধরনের সংযোগ প্রভাব সৃষ্টি হয়। একটি হল **সম্মুখগতি সংযোগ প্রভাব** (Forward linkage effect) এবং অপরটি হল **পশ্চাৎগতি সংযোগ প্রভাব** (Backward linkage effect)। কোন একটি ক্ষেত্রের বিকাশ ঘটলে সেই

ক্ষেত্রটি অন্য ক্ষেত্রগুলিকে উৎপাদনের উপকরণ যোগান দিয়ে সাহায্য করতে পারে। এটিকে সম্মুখগতিসম্পন্ন সংযোগ প্রভাব বলা হয়। উদাহরণস্বরূপ, লৌহ ও ইস্পাতের কারখানা গড়ে উঠলে এই কারখানায় যে লোহা উৎপন্ন হবে সেটি অন্য পাঁচটি শিল্পে সম্মুখগতি সংযোগ প্রভাব। অন্যদিকে কোন একটি ক্ষেত্র অপর ক্ষেত্রগুলি থেকে যে পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রী কেনে সেটি হল ঐ ক্ষেত্রের পশ্চাৎগতি সংযোগ প্রভাব। উদাহরণস্বরূপ, লৌহ ও ইস্পাত শিল্প কয়লা শিল্পের কাছ থেকে যে কয়লা কেনে বা লৌহ আকরিক শিল্প থেকে যে লৌহ আকরিক কেনে সেটি হল লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের পশ্চাৎগতি সংযোগ প্রভাব। প্রতিটি ক্ষেত্রেরই এরূপ সম্মুখগতি সংযোগ প্রভাব ও পশ্চাৎগতি সংযোগ প্রভাব পরিমাপ করা যেতে পারে।

হার্সম্যানের মতে যে সমস্ত শিল্পের মোট সংযোগ প্রভাব সর্বাপেক্ষা বেশি সেই শিল্পগুলিকেই আগে গ্রহণ করতে হবে এবং সেগুলির বিকাশের জন্যই সর্বাপেক্ষা বেশি জোর দিতে হবে। এর ফলে এই ক্ষেত্রগুলির বিকাশ অন্য ক্ষেত্রগুলিকে বিকশিত হতে সাহায্য করবে। অর্থনীতির কোন একটি ক্ষেত্রে এইভাবে বিনিয়োগ করলে সেই ক্ষেত্রের সঙ্গে অন্য ক্ষেত্রের ভারসাম্য সাময়িকভাবে বিনষ্ট হয়। তার ফলে স্বল্পকালে অনটন বা অতিরিক্ত উৎপাদন ক্ষমতা দেখা দেয়। পরে সম্মুখগতি এবং পশ্চাৎগতি সংযোগের মাধ্যমে অন্য ক্ষেত্রগুলিও বিকাশলাভ করে। কালক্রমে এই অনটন বা অতিরিক্ত উৎপাদন ক্ষমতা দূর হয়। এইভাবে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটে থাকে। দেশের উপকরণ-উৎপন্ন সারণি (Input-Output table) থেকে কোন্ ক্ষেত্রের সংযোগ প্রভাব কত সেটি জানা যেতে পারে। যে সকল ক্ষেত্রের সংযোগ প্রভাব সর্বাপেক্ষা বেশি সেই ক্ষেত্রগুলিকেই আগে অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য গ্রহণ করতে হবে, কারণ এগুলিই অন্যান্য ক্ষেত্রকে সর্বাপেক্ষা বেশি উৎসাহ দান করবে এবং অন্যান্য ক্ষেত্রের উন্নয়নে পরোক্ষভাবে সাহায্য করবে।

হার্সম্যানের মতে অনুন্নত দেশে কৃষি এবং শিল্পক্ষেত্রের মোট সংযোগ প্রভাবের মধ্যে যদি আমরা একটি তুলনামূলক আলোচনা করি তাহলে দেখা যায় যে কৃষিক্ষেত্রের সম্মুখগতি সংযোগ প্রভাব কিছুটা থাকলেও পশ্চাৎগতি সংযোগ প্রভাব খুব কম। কৃষিক্ষেত্র মোটামুটিভাবে স্বয়ং সম্পূর্ণ। এটি অন্য ক্ষেত্র থেকে খুব বেশি পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রী কেনে না। ফলে কৃষিক্ষেত্রের পশ্চাৎগতি সংযোগ প্রভাব খুব কম। অন্যদিকে শিল্পক্ষেত্রে উভয় ধরনের সংযোগ প্রভাবই বেশি। সুতরাং মোট সংযোগ প্রভাবের মাপকাঠি দিয়ে বিচার করতে গেলে বলা যেতে পারে যে কৃষিক্ষেত্র অপেক্ষা শিল্পক্ষেত্রেই মোট সংযোগ প্রভাব সব থেকে বেশি। সেজন্য অনুন্নত দেশের উচিত শিল্পক্ষেত্রে অধিক জোর দেওয়া। আবার শিল্পক্ষেত্রের মধ্যেও ভোগ্য দ্রব্য উৎপাদনকারী শিল্প এবং মূলধনী দ্রব্য উৎপাদনকারী শিল্প—এই দুটির মধ্যে যদি আমরা তুলনা করি তাহলে দেখা যায় যে ভোগ্য দ্রব্য উৎপাদনকারী শিল্পের ক্ষেত্রে সম্মুখগতি সংযোগ প্রভাব খুবই কম, যদিও তার পশ্চাৎগতি সংযোগ প্রভাব রয়েছে। অন্যদিকে মূলধনী দ্রব্য উৎপাদনকারী শিল্পের ক্ষেত্রে সম্মুখগতি এবং পশ্চাৎগতি সংযোগ প্রভাব উভয়ই শক্তিশালী। সুতরাং ভোগ্য দ্রব্যের তুলনায় মূলধনী দ্রব্যের উৎপাদনে অধিক জোর দেওয়া উচিত বলে হার্সম্যান মনে করেন।

5.5. অসম উন্নয়ন কৌশলের মূল্যায়ন (An Evaluation of the Unbalanced Growth Strategy) :

অসম উন্নয়ন তত্ত্ব নির্বাচিত কয়েকটি ক্ষেত্রে বিনিয়োগের দ্বারা অর্থনৈতিক উন্নয়নের সুপারিশ করে। এই তত্ত্বের সমর্থকগণের মতে, এর দ্বারা স্বল্পোন্নত দেশের সীমিত উপকরণের সার্থক ব্যবহার সম্ভব। তাছাড়া, যদি মূলধন দুষ্প্রাপ্য এবং অবিভাজ্য হয় তাহলে কয়েকটি দ্রব্যের উৎপাদনের ক্ষেত্রে সেই মূলধন সর্বোত্তম মাত্রায় কেন্দ্রীভূত করা প্রয়োজন। অনেক দ্রব্য অদক্ষ মাত্রায় (sub-optimal level) উৎপাদন করা অপেক্ষা কিছু সংখ্যক দ্রব্য দক্ষ বা কাম্য মাত্রায় (optimum level) উৎপাদন করা শ্রেয় কারণ সমতা অপেক্ষা দক্ষতা বৃদ্ধিই কাম্য। অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রতি এই দৃষ্টিভঙ্গি অনেক বেশি যুক্তিসঙ্গত এবং বাস্তবসম্মত। আমরা **অসম উন্নয়ন কৌশলের পক্ষে বিশেষ কতকগুলি যুক্তি** উল্লেখ করতে পারি।

প্রথমত, অসম উন্নয়ন কৌশলে সমাজের কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্রের উপর বিনিয়োগ বৃদ্ধি করা হয়। যে সকল ক্ষেত্রের উপর বিনিয়োগ বৃদ্ধি করলে অর্থনৈতিক অগ্রগতির হার সর্বাপেক্ষা বেশি হ'তে পারে সেই সকল ক্ষেত্রকেই বেছে নেওয়া হয়। ফলে কম মূলধনের প্রয়োজন হয় এবং উন্নয়নের হারও বেশ উঁচু হয়ে থাকে।

দ্বিতীয়ত, সুষম উন্নয়ন কৌশল গ্রহণ করতে হলে সরকারকে অধিক পরিমাণ সক্রিয় হতে হয়। সরকারকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করতে হয় এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রের বিকাশের মধ্যে যাতে ভারসাম্য বজায় থাকে সেদিকে লক্ষ রাখতে হয়। অন্যদিকে অসম উন্নয়ন কৌশলে সরকারের ভূমিকা অনেক কম। অসম উন্নয়ন কৌশল গ্রহণ করলে বাজার ব্যবস্থার উপর কিছুটা নির্ভর করা হয়। সরকার কয়েকটি ক্ষেত্রে শুধুমাত্র বিনিয়োগ করে থাকে এবং এটি আশা করা হয় যে এই ক্ষেত্রগুলিতে বিনিয়োগ করার ফলে বাজার ব্যবস্থার মাধ্যমে অন্যান্য ক্ষেত্রেও বেসরকারি বিনিয়োগ ঘটে থাকবে। তার ফলে স্বল্প পরিমাণ সরকারি প্রচেষ্টার মাধ্যমেই অসম উন্নয়ন কৌশলে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব।

তৃতীয়ত, সুষম উন্নয়ন কৌশল প্রয়োগ করার জন্য প্রচুর পরিমাণ মূলধন, দক্ষ শ্রমিক ও উদ্যোক্তা প্রয়োজন। এই পরিমাণ মূলধন সংগ্রহ করতে হলে দেশকে বিদেশ থেকে মূলধন আমদানি করতে হবে। কিন্তু অসম উন্নয়ন কৌশলের ক্ষেত্রে দেশটি বিদেশ থেকে মূলধন আমদানি না করেই স্বয়ংসম্পূর্ণভাবে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটাতে পারে।

চতুর্থত, Hirschman এবং Singer-এর মতে, অনুন্নত দেশের পক্ষে সুষম উন্নয়ন কৌশল গ্রহণ করা সম্ভব নয়। এর জন্য যে পরিমাণ অর্থনৈতিক সম্পদ থাকা প্রয়োজন, স্বল্পোন্নত দেশে সেই পরিমাণ সম্পদ থাকে না। শুধু তাই নয়। Hirschman মনে করেন যে, সুষম উন্নয়ন কৌশল প্রয়োগ করার কোন প্রয়োজনও নেই। এর পরিবর্তে অসম উন্নয়ন কৌশলের দ্বারা যদি ভারসাম্যহীনতা সৃষ্টি করা হয়, তবে যে প্রেরণা ও চাপ সৃষ্টি হবে, তার দ্বারা আরো দ্রুত উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব। সুতরাং, অসম উন্নয়ন কৌশল অনুন্নত দেশের সম্পদের অপ্রাচুর্যতার সমস্যাই শুধু বিবেচনা করে নি, এই তত্ত্ব সেই সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহারেরও চেষ্টা করে।

পঞ্চমত, Hirschman-এর মতে, সম্পদের অপ্রতুলতা সত্ত্বেও প্রতিটি স্বল্পোন্নত দেশে কিছু না কিছু বিনিয়োগ সদাসর্বদা সংঘটিত হয়। আর এই বিনিয়োগ স্বভাবতই অসম প্রকৃতির কারণ এটা কোন বিবেচনাপ্রসূত সিদ্ধান্তের ফলশ্রুতি নয়। তাই অসম উন্নয়নের সংশোধন করে সমতা ফিরিয়ে আনবার জন্যই আর এক দফা অসম বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা দরকার।

ষষ্ঠত, অসম উন্নয়ন কৌশল সেই সমস্ত শিল্পের উন্নয়নের উপর জোর দেয় যে সমস্ত শিল্পের সংযোগ বা ব্যাপ্তি প্রভাব সর্বাধিক। এর ফলে স্বল্পোন্নত দেশের প্রাথমিক অনড়তা কাটিয়ে দেশটিকে স্বয়ংচালিত উন্নয়নের পথে স্থাপন করা সম্ভব হবে। তাছাড়া, সম্মুখ ও পশ্চাদ্‌মুখী সংযোগ প্রভাবের ফলে আরও অনেক শিল্পের উন্নতি ঘটবে এবং দেশটির উন্নয়নের হার ত্বরান্বিত হবে।

সপ্তমত, অসম উন্নয়ন কৌশল আপেক্ষিক সুবিধার নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। এই তত্ত্বের মতে, কোন দেশের সেই সমস্ত অর্থনৈতিক কার্যকলাপে বিশেষায়ণ প্রবর্তন করা উচিত যাতে দেশটির তুলনামূলক বা আপেক্ষিক সুবিধা বেশি। তাতে দেশটির সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার সুনিশ্চিত হয়। অসম উন্নয়ন কৌশলের মূল অর্থনৈতিক যুক্তিটি এই আপেক্ষিক সুবিধার যুক্তির অনুরূপ।

তবে **অসম উন্নয়নের বিরুদ্ধেও কয়েকটি যুক্তি** উপস্থাপিত করা যেতে পারে। সেগুলি হল নিম্নরূপঃ

প্রথমত, অসম উন্নয়ন কৌশল গ্রহণ করার সময় অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে একটি অনিশ্চয়তা দেখা দেয়। অসম উন্নয়ন কৌশলে ধরে নেওয়া হয় যে একটি ক্ষেত্রের বিকাশ ঘটলে বেসরকারি বিনিয়োগকারীরা এগিয়ে আসে তাহলেই অন্যান্য ক্ষেত্রের বিকাশ ঘটবে। কিন্তু যদি বেসরকারি বিনিয়োগকারীরা এগিয়ে না আসে তাহলে অন্য ক্ষেত্রের বিকাশ ঘটবে না। কাজেই অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে একটি অনিশ্চয়তা রয়েছে।

দ্বিতীয়ত, অসম উন্নয়ন কৌশল গ্রহণ করলে চাহিদা এবং যোগানের ক্ষেত্রে ভারসাম্য থাকে না। কাজেই এক্ষেত্রে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিতে পারে। অসম উন্নয়ন কৌশলে ধরে নেওয়া হয় যে, যে সকল ক্ষেত্রে দুষ্প্রাপ্যতার সৃষ্টি হচ্ছে সেইসব ক্ষেত্রে দাম বৃদ্ধি পাবে এবং সেখানে প্রণোদিত বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাবে। কিন্তু এই দাম ব্যবস্থা অনেক ক্ষেত্রেই ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করতে ব্যর্থ হয়। তাছাড়া যখন দাম বাড়তে থাকে তখন সেটি শুধুমাত্র আর ঐ ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ থাকে না। অচিরেই এটি সমগ্র অর্থনীতিতে ছড়িয়ে পড়ে এবং দ্রুত হারে মুদ্রাস্ফীতি অর্থনৈতিক উন্নয়নকে ব্যাহত করে। বিভিন্ন ক্ষেত্রের অসম উন্নয়নের জন্য যে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়, সেই মুদ্রাস্ফীতিকে চিরাচরিত আর্থিক ব্যবস্থার মাধ্যমে দূর করা যায় না। বিভিন্ন ক্ষেত্রের মধ্যে সমতা স্থাপন করতে না পারলে এই মুদ্রাস্ফীতিকে দূর করা যায় না।

তৃতীয়ত, অসম উন্নয়ন কৌশলে যে সংযোগ প্রভাবের কথা বলা হয় সেগুলি স্বল্পোন্নত দেশে খুব বেশি সক্রিয় নয়। অনেক অর্থনীতিবিদ মনে করেন যে অনুন্নত দেশে বিভিন্ন ক্ষেত্রের মধ্যে সংযোগ প্রভাব খুবই দুর্বল। এইরূপ অবস্থায় DPA বৃদ্ধির দ্বারা উন্নয়ন ঘটানোর চেষ্টা করা হলে সেটি ফলপ্রসূ হবে না। তাছাড়া কোন্ ক্ষেত্রের সংযোগ প্রভাব কত এটি সহজে পরিমাপ করা যায় না। সেজন্য অসম উন্নয়ন তত্ত্ব কার্যকর করা শক্ত।

চতুর্থত, অসম উন্নয়ন কৌশলে সরকারের ভূমিকা কম থাকে। এখানে বাজার ব্যবস্থার উপরেই অধিক জোর দেওয়া হয়। তবে ধরা হয় যে, সরকারের কাজ হল ন্যূনতম পরিমাণ সামাজিক মূলধন গঠন করা। এই ন্যূনতম পরিমাণ কতটা হবে সে সম্পর্কে কোন সুস্পষ্ট ধারণা এই তত্ত্বে দেওয়া হয় নাই।

পঞ্চমত, অসম উন্নয়ন প্রচেষ্টায় সম্প্রসারণ প্রেরণার (stimuli) উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। কিন্তু এর দ্বারা সৃষ্ট বাধা বা অসুবিধাগুলো দূর বা হ্রাস করার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয় না।

ষষ্ঠত, অসম উন্নয়ন তত্ত্বে কয়েকটি মাত্র দ্রব্য উৎপাদনের উপরে বিশেষ গুরুত্ব দিতে হয়। ফলে দেশটিকে ঐ কয়েকটি দ্রব্যের উৎপাদনের উপর একান্তরূপে নির্ভরশীল হতে হয়। যদি ঐ সকল দ্রব্যের বৈদেশিক চাহিদা অস্থিতিস্থাপক হয় তবে লেনদেন উদ্বৃত্তের উপর বিরূপ প্রভাব পড়তে পারে।

সপ্তমত, অসম উন্নয়ন তত্ত্বে ধরা হয় যে কৃষিক্ষেত্র অপেক্ষা শিল্প ক্ষেত্রে সংযোগ প্রভাব বেশি। সুতরাং স্বল্পোন্নত দেশে শিল্পের উপরেই জোর দেওয়া দরকার। কিন্তু অনেকে এই বক্তব্যটি স্বীকার করেন না। কৃষির উন্নয়নকে অবহেলা করে কোন একটি স্বল্পোন্নত দেশ কখনই অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটাতে পারে না। কৃষি এবং শিল্পের মধ্যে একটি সুষম বিকাশ ঘটা প্রয়োজন। কিন্তু সেটি অসম উন্নয়ন কৌশলের ক্ষেত্রে স্বীকার করা হয় না।

অষ্টমত, অসম উন্নয়ন কৌশলে ধরা হয় যে অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রের মধ্যে ভারসাম্যকে নষ্ট করে দেওয়া উচিত। ভারসাম্যহীনতাই অর্থনৈতিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করে—এরূপ ধারণা অসম উন্নয়ন কৌশলে পোষণ করা হয়। আশা করা হয় যে অর্থনৈতিক উন্নয়নের ফলে নষ্ট ভারসাম্য পুনরায় ফিরে আসবে। যদি অর্থনীতির মধ্যে স্থায়ী ভারসাম্যের শর্তাবলি (Stability conditions) বিদ্যমান থাকে তাহলেই পুনরায় ভারসাম্য ফিরে আসবে। কিন্তু যদি এই শর্তাবলি পূরণ না হয় তাহলে ভারসাম্য বিনষ্ট হলে পুনরায় ভারসাম্য ফিরে আসে না।

নবমত, অসম উন্নয়ন কৌশলে ভারি মূলধনী শিল্পের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। কিন্তু এর জন্য প্রচুর যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জাম আমাদানি করার প্রয়োজন হতে পারে। ফলে স্বল্পোন্নত দেশে বৈদেশিক মুদ্রার সংকট দেখা দিতে পারে।

দশমত, অর্থনীতিবিদ S.K.Nath মনে করেন যে, অসম উন্নয়ন কৌশল ঘাটতি, ভারসাম্যহীনতা ও নানা বাধার সৃষ্টি করে। এর ফলে উন্নয়ন প্রক্রিয়া বাধা প্রাপ্ত হতে পারে বলে অধ্যাপক নাথ মনে করেন।

তাহলে প্রশ্ন হ'ল, অনুন্নত দেশের কোন্ উৎপাদন কৌশল গ্রহণ করা উচিত ? অর্থনৈতিক ইতিহাসে এর কোন স্পষ্ট উত্তর নেই। ইংলণ্ডে কৃষি ও শিল্পের সুষম উন্নয়ন শিল্পবিপ্লব ঘটাতে সাহায্য করেছিল। জাপানের প্রাথমিক উন্নয়নের দৃষ্টান্ত হল কৃষি ও শিল্পের মধ্যে সুষম উন্নয়নের দৃষ্টান্ত। কিন্তু তৎকালীন সোভিয়েত

রাশিয়া অসম উন্নয়ন কৌশল গ্রহণ করে দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটাতে পেরেছিল। সেখানে কৃষির তুলনায় শিল্পে, আবার শিল্পের মধ্যে ভোগ্যপণ্যের শিল্প অপেক্ষা মূলধনী শিল্পের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করে আশাতীত সাফল্য পাওয়া গিয়েছিল। সুতরাং অতীত তথ্যের ভিত্তিতে আমরা কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারছি না। তবে আমরা বলতে পারি যে, উন্নয়ন কৌশল নির্বাচনে তিনটি বিষয়ের উপর গুরুত্ব দেওয়া উচিত। এই তিনটি বিষয় হল ঃ (i) সম্পদের পরিমাণ, (ii) উন্নয়নের বাঞ্ছিত হার এবং (iii) পরিকল্পনার সময়কাল। অর্থনীতিটির যদি পর্যাপ্ত পরিমাণ সম্পদ থাকে, যদি বাঞ্ছিত উন্নয়নের হার নিম্ন হয় এবং যদি পরিকল্পনার সময়কাল দীর্ঘ হয়, তাহলে দেশটির পক্ষে সুষম উন্নয়ন কৌশল গ্রহণ করা ভালো। অপরদিকে, যদি বিনিয়োগযোগ্য সম্পদ সীমিত হয়, যদি স্বল্পকালের মধ্যেই উচ্চতর উন্নয়নের হার অর্জন করার প্রয়োজন হয়, তাহলে দেশটির পথে সর্বোত্তম নীতি হল অসম উন্নয়ন কৌশল গ্রহণ করা। এখন, স্বল্পোন্নত দেশে সম্পদ সীমিত। তাছাড়া, উন্নত দেশের সঙ্গে উন্নয়নের ব্যবধান কমাতে গেলে অনুন্নত দেশগুলোর স্বল্পকালের মধ্যে উচ্চতর উন্নতির হার অর্জন করা প্রয়োজন। এদিক হতে দেখতে গেলে আমরা বলতে পারি যে, স্বল্পোন্নত দেশগুলোর অসম উন্নয়ন কৌশল গ্রহণ করা যুক্তিযুক্ত। অবশ্য দেশগুলোকে সতর্ক থাকতে হবে যাতে বিভিন্ন ক্ষেত্রের মধ্যে ভারসাম্যহীনতা নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে না যায় এবং এর ফলে তা যেন উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় নানা সমস্যার সৃষ্টি না করে।

5.6. সুষম ও অসম উন্নয়ন কৌশলের মধ্যে তুলনা (Comparison between Balanced Growth Strategy and Unbalanced Growth Strategy) ঃ

কোন একটি অনুন্নত দেশের পক্ষে সুষম উন্নয়ন কৌশল গ্রহণ করা উচিত না কি অসম উন্নয়ন কৌশল গ্রহণ করা উচিত এ সম্পর্কে অর্থনীতিবিদদের মধ্যে বিতর্ক আছে। কোন কোন অর্থনীতিবিদ মনে করেন যে অনুন্নত দেশের উচিত সুষম উন্নয়ন কৌশল গ্রহণ করা। আবার কোন কোন অর্থনীতিবিদ মনে করেন যে অনুন্নত দেশের উচিত অসম উন্নয়ন কৌশল গ্রহণ করা। উভয় প্রকার উন্নয়ন কৌশলের মধ্যে একটি তুলনামূলক আলোচনা এখন আমরা করতে পারি।

সুষম উন্নয়ন কৌশল এবং অসম উন্নয়ন কৌশলের মধ্যে কয়েকটি দিক দিয়ে **পার্থক্য** লক্ষ করা যায়।

প্রথমত, সুষম উন্নয়ন কৌশলে বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে একই সঙ্গে অধিক পরিমাণ বিনিয়োগ করার কথা বলা হয়। কিন্তু অসম উন্নয়নে একটি বা দুটি ক্ষেত্রে বা অল্প কয়েকটি ক্ষেত্রেই কেবলমাত্র অধিক হারে বিনিয়োগ করার কথা বলা হয়।

দ্বিতীয়ত, সুষম উন্নয়ন কৌশলে ধরে নেওয়া হয় যে অনুন্নত দেশে মূলধনের পরিমাণ প্রচুর রয়েছে। ফলে অনুন্নত দেশ একসঙ্গে অনেকগুলি ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করতে পারবে। কিন্তু অসম উন্নয়ন কৌশলে ধরা হয় যে অনুন্নত দেশে মূলধনের অভাব রয়েছে। ফলে একসঙ্গে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করা সম্ভব নয়। অল্প কয়েকটি ক্ষেত্রেই দুষ্প্রাপ্য মূলধনকে বিনিয়োগ করতে হবে। যে সমস্ত ক্ষেত্রে মূলধন বিনিয়োগ করলে অর্থনৈতিক উন্নয়ন দ্রুততর হবে সেই সমস্ত ক্ষেত্রেই মূলধন বিনিয়োগ সীমিত রাখতে হবে।

তৃতীয়ত, সুষম উন্নয়ন কৌশলে সামাজিক মূলধন গঠন এবং চাহিদা ও যোগানের দিকে অবিভাজ্যতা রয়েছে বলে স্বীকার করে নেওয়া হয়। এই উন্নয়ন কৌশলে ধরে নেওয়া হয় যে একসঙ্গে বড় ধরনের বিনিয়োগের মাধ্যমেই এই অবিভাজ্যতা দূর করা যেতে পারে। কিন্তু অসম উন্নয়ন কৌশলে এই অবিভাজ্যতার কথা স্বীকার করা হয় না। অসম উন্নয়ন কৌশলে ধরা হয় যে অল্প অল্প করে অগ্রসর হলে দেশ অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটাতে পারবে। অবিভাজ্যতার সমস্যাটির গুরুত্ব অসম উন্নয়ন কৌশলে বিচার করা হয় না।

চতুর্থত, সুষম উন্নয়ন কৌশলে বিভিন্ন দ্রব্যের মধ্যে পরিপূরকতার সম্পর্ককে সদ্ব্যবহার করা হয়। সুষম উন্নয়ন কৌশলে ধরা হয় যে বিভিন্ন দ্রব্যের মধ্যে পরিপূরক সম্পর্ক থাকার জন্য কতকগুলি দ্রব্যকে একসঙ্গে উৎপাদন করা হলে বাহ্যিক ব্যয় সংকোচ পাওয়া যাবে। তার ফলে সামাজিক উৎপাদন ব্যয় কম হবে। কিন্তু অসম উন্নয়ন কৌশলে এটি ধরা হয় না। বরঞ্চ অসম উন্নয়ন কৌশলে দ্রব্যের অভাব ঘটিয়ে স্বয়ংক্রিয়

পদ্ধতিতে ধীরে ধীরে দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদন বৃদ্ধি করতে চাওয়া হয়। অসম উন্নয়ন কৌশলে ধরা হয় যে, সকল দ্রব্যের উৎপাদন একসঙ্গে না বাড়িয়ে মাত্র কয়েকটি দ্রব্যের উৎপাদন বাড়ালে যে অভাব সৃষ্টি হবে তার দ্বারাই অন্য দ্রব্যগুলির উৎপাদন স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাড়বে।

পঞ্চমত, সুষম উন্নয়ন কৌশলে SOC এবং DPA এই উভয় প্রকার বিনিয়োগকে সমহারে বর্ধিত করা হয়। উভয়ের মধ্যে কোন একটিকে নির্বাচন করা হয় না। কিন্তু অসম উন্নয়ন কৌশলে স্বীকার করা হয় যে উপকরণের পরিমাণ স্বল্প হওয়ার জন্য অনুন্নত দেশের পক্ষে SOC এবং DPA উভয়ের একযোগে বৃদ্ধি করা সম্ভব নয়। সেজন্য অর্থনীতিতে SOC এবং DPA উভয়ের মধ্যে যে কোন একটিকে বেছে নিতে হবে এবং যে কোন একটির ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করতে হবে।

অবশ্য সুষম উন্নয়ন কৌশল এবং অসম উন্নয়ন কৌশলের মধ্যে এই পার্থক্যগুলি থাকা সত্ত্বেও উভয় কৌশলের মধ্যে কয়েকটি মিলও লক্ষ করা যায়।

প্রথমত, উভয় কৌশলেই স্বীকার করে নেওয়া হয় যে অনুন্নত অর্থনীতির অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য একটি পরিকল্পনা প্রয়োজন। পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে ব্যাপক বিনিয়োগ ঘটানো সম্ভব। কোন্ কোন্ ক্ষেত্রের মধ্যে পরিপূরক সম্পর্ক রয়েছে বা কোন ক্ষেত্রের উৎপন্ন দ্রব্যের চাহিদা এবং যোগান কত হবে সেগুলি পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষ সঠিকভাবে পরিমাপ করতে পারবে। এইভাবে পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে সুষম উন্নয়ন ঘটাতে হবে। অনুরূপভাবে অসম উন্নয়ন কৌশলে ধরা হয় যে পরিকল্পিত উপায়ে মুষ্টিমেয় কয়েকটি ক্ষেত্রে অধিক জোর দিতে হবে। বিশেষ ধরনের ভারসাম্যহীনতা পরিকল্পনার মাধ্যমেই সৃষ্টি করা সম্ভব।

দ্বিতীয়ত, সুষম উন্নয়ন কৌশলে বাজার ব্যবস্থার উপর কিছুটা নির্ভরশীলতা থাকে। আবার অসম উন্নয়ন কৌশলেও বাজার ব্যবস্থার উপর কিছুটা নির্ভরশীলতা থাকে। সুষম উন্নয়ন কৌশলে ধরা হয় যে একসঙ্গে বৃহৎ বিনিয়োগ করলে বাজারের আয়তনজনিত সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হবে এবং ব্যক্তিগত উদ্যোক্তারা বিনিয়োগ করতে এগিয়ে আসবে। অনুরূপভাবে অসম উন্নয়ন কৌশলেও ধরা হয় যে কোন একটি ক্ষেত্রে অভাব সৃষ্টি হলে এই অভাব পূরণের জন্য ব্যক্তিগত উদ্যোগীরা এগিয়ে আসবে। সুতরাং উভয় প্রকার উন্নয়ন কৌশলেই ব্যক্তিগত উদ্যোগীদের বা বাজার ব্যবস্থাকে স্বীকার করে নেওয়া হচ্ছে।

অনেকে মনে করেন যে সুষম উন্নয়ন কৌশল ও অসম উন্নয়ন কৌশলের মধ্যে মূলত কোন বিরোধ নেই। উভয়েই একে অপরের পরিপূরক মাত্র। তাঁদের মতে অসম উন্নয়ন কৌশল হল একটি উপায় মাত্র (means) এবং সেটি হল সুষম উন্নয়ন অর্জন করার উপায়। সুষম উন্নয়ন হল লক্ষ্য (ends), আর সেই লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য অসম উন্নয়ন হল উপায় (means)। কাজেই উভয়ের মধ্যে মূলত কোন পার্থক্য নেই। সুষম উন্নয়নের ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রতি ধাপেই বিভিন্ন ক্ষেত্রের মধ্যে সমতা রক্ষা করা হয়। অন্যদিকে অসম উন্নয়ন কৌশলে অর্থনৈতিক উন্নয়নের একটি স্তরে বিভিন্ন ক্ষেত্রের বিকাশের মধ্যে অসমতা লক্ষ করা গেলেও সবশেষে বিভিন্ন ক্ষেত্রের বিকাশের মধ্যে সমতা লক্ষ করা যায়। আবার অসম উন্নয়ন কৌশলে যে ক্ষেত্রগুলিকে বেছে নিয়ে বিনিয়োগ করা হয় সেই ক্ষেত্রগুলির মধ্যেও একটি ভারসাম্য থাকা দরকার। কাজেই অসম উন্নয়ন কৌশল গ্রহণ করলেও সেখানেও কিছুটা সুষম উন্নয়ন প্রয়োজন। আবার সুষম উন্নয়ন কৌশল গ্রহণ করার অর্থও কিন্তু এই নয় যে অর্থনীতির প্রতিটি ক্ষেত্রে সম পরিমাণ বিনিয়োগ করতে হবে বা অর্থনীতির প্রতিটি ক্ষেত্রে মোট বিনিয়োগের সমান অংশ ব্যবহার করতে হবে। যে ক্ষেত্রটি অপেক্ষাকৃত বেশি গুরুত্বপূর্ণ অর্থাৎ যে ক্ষেত্রের উৎপন্ন দ্রব্যের চাহিদা বেশি, সেই ক্ষেত্রের উৎপন্ন দ্রব্যের চাহিদা এবং যোগান সমান করার জন্য স্বভাবতই সেই ক্ষেত্রে অধিক পরিমাণ বিনিয়োগ করতে হবে। কাজেই সুষম উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ক্ষেত্রের উন্নয়নের হার বিভিন্ন প্রকার হতে পারে বা বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন হারে বিনিয়োগ করা হতে পারে। এদিক থেকে দেখতে গেলে সুষম উন্নয়নের ক্ষেত্রেও বিভিন্ন ক্ষেত্রের মধ্যে একটি অসম বিকাশ লক্ষ করা যেতে পারে।

ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে লক্ষ করলে দেখা যায় যে পুরোপুরি সুষম উন্নয়ন কোন দেশেই সম্ভব হয় নাই। সমস্ত উন্নত দেশই অন্তত কিছুটা অসম উন্নয়নের পথে অগ্রসর হয়েছে। প্রতিটি দেশেরই অর্থনৈতিক উন্নয়নের সময় লক্ষ করা যায় যে একটি বা দুটি ক্ষেত্র অধিক হারে বৃদ্ধি পায়। এগুলিকে **অগ্রণী ক্ষেত্র** (Leading sectors) বলা হয়। অগ্রণী ক্ষেত্রের বিকাশের পর অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রক্রিয়া অন্যান্য ক্ষেত্রে ছড়িয়ে পড়ে। সুতরাং ইতিহাসের দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায় অসম উন্নয়নই বিভিন্ন দেশে ঘটেছে।

উপসংহারে বলা যেতে পারে যে তত্ত্বগত দিক থেকে সুষম উন্নয়ন কৌশল গ্রহণযোগ্য হলেও বাস্তবে অনুন্নত দেশের পক্ষে সুষম উন্নয়ন কৌশল গ্রহণ করা সম্ভব নয়। কাজেই অনুন্নত দেশের পক্ষে অসম উন্নয়ন কৌশল গ্রহণ করাই যুক্তিযুক্ত। তবে মনে রাখতে হবে যে অধিক মাত্রায় ভারসাম্যহীনতা কখনোই কাম্য নয়। কাজেই অসম উন্নয়ন কৌশল গ্রহণ করলেও যে ক্ষেত্রগুলিকে প্রথমে প্রসার ঘটানোর জন্য নির্বাচন করা হচ্ছে সেগুলির মধ্যে যাতে একটি ভারসাম্য বজায় থাকে সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন।

5.7. উৎপাদন কৌশল নির্বাচন (Choice of Technique) ঃ

অনুন্নত দেশগুলির কোন্ ধরনের উৎপাদন কৌশল গ্রহণ করা উচিত অর্থাৎ অনুন্নত দেশগুলির শ্রম-নিবিড় উৎপাদন কৌশল গ্রহণ করা উচিত না মূলধন-নিবিড় উৎপাদন কৌশল গ্রহণ করা উচিত এই বিষয়টি **কৃৎকৌশল পছন্দের সমস্যা** (Problem of choice of technique) নামে পরিচিত। অনেকে মনে করেন যে অনুন্নত দেশগুলিতে যেহেতু অধিক শ্রমিক রয়েছে এবং অনুন্নত দেশগুলিতে যেহেতু মূলধনের পরিমাণ স্বল্প সুতরাং অনুন্নত দেশগুলির উচিত শ্রম-নিবিড় উৎপাদন কৌশল গ্রহণ করা। অনেকে অবশ্য এই মত স্বীকার করেন না। অনেকে মনে করেন যে শ্রম-নিবিড় উৎপাদন কৌশল গ্রহণ করলে অনুন্নত দেশগুলি বর্তমানে কিছুটা লাভবান হতে পারে ঠিকই, কিন্তু তাতে তাদের ভবিষ্যৎ উন্নতির সম্ভাবনা কমে যায়। সুতরাং অনুন্নত দেশগুলির উচিত শ্রম-নিবিড় উৎপাদন কৌশল গ্রহণ না করে মূলধন-নিবিড় উৎপাদন কৌশল গ্রহণ করা।

অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেনের মতে, কোন একটি দেশের উৎপাদন কৌশল শ্রম-নিবিড় হওয়া উচিত, না মূলধন-নিবিড় হওয়া উচিত তা দুটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে। **প্রথমত,** এই নির্বাচন সময়কালের উপর নির্ভর করে অর্থাৎ আমরা স্বল্পকাল না দীর্ঘকাল—কোন্‌টির উপর বেশি গুরুত্ব আরোপ করছি তার উপর নির্ভর করে। **দ্বিতীয়ত,** কোন দেশের কৃৎকৌশল নির্বাচন ঐ দেশের লক্ষ্যের উপরও নির্ভর করে অর্থাৎ অর্থনীতিটি বর্তমান উৎপাদনকে সর্বাধিক করতে চায়, নাকি বর্তমান উদ্বৃত্তকে সর্বাধিক করতে চায় তার উপরও নির্ভর করে। আমরা অমর্ত্য সেনের এই দুটি যুক্তি এখন আলোচনা করবো।

প্রথমত, আমরা বলেছি যে, কোন দেশের শ্রম-প্রগাঢ় উৎপাদন পদ্ধতি গ্রহণ করা উচিত না কি মূলধন-প্রগাঢ় উৎপাদন পদ্ধতি গ্রহণ করা উচিত সেটি সময়কালের উপরও নির্ভর করে। যদি আমরা স্বল্পকালটিকেই